CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM-V DSE-2 : United Nations and Global Conflicts
TOPIC– I (b) : United Nations - Principles and Objectives
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি

(Principles and Objectives of the United Nations)

জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো না গেলেও, অনেকের মনে এই বিশ্বাস বর্তমান ছিল যে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক প্রচষ্টার মাধ্যমে একটি উন্নত যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে যার সাহায্যে ভবিষ্যতে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে বিশ্বকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন ছিল লিগের নতুন,মতো, কিন্তু আরও উন্নত, একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দেই লক্ষ্য করা যায় যে মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি নিজেদের **'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ'** (United |Nations) নামে অভিহিত করতে শুরু করেছিল। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মস্কো ঘোষণায় (Moscow Declaration) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভব ছোট বড় নির্বিশেষে সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিত্বে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যে সম্মেলনগুলির মাধ্যমে উপরোক্ত পর্যায়গুলির ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেগুলি হল ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত (Tehran Conference), ১৯৪৪-এর ডাম্বারটোন ওকস্ সম্মেলন (Dumbarton Oaks Conference), এবং ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইয়ালটা সম্মেলন (Yalta Conference) ও সানফ্রানসিস্কো সম্মেলন (San Francisco Conference)।
ডাম্বারটোন ওকস্ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী চারটি রাষ্ট্র যে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আসে সেগুলির উপর ভিত্তি করেই সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধানের, যা সনদ (Charter) নামে পরিচিত, খসড়া তৈরি করে। এই ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলি সনদের ১নং ধারায় লিখিত আছে।

সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল - **শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া, কোন আশংকার কারণ দেখা দিলে তাকে দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নকারী পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ উপায়ে মোকাবিলা করা।**

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল - **সমানাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তোলা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে জাতিপুঞ্জের শান্তি-স্থাপনের প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তর করা।**

তৃতীয় লক্ষ্য হল - আন্তর্জাতিক করা এবং মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা-বৃদ্ধি করা।

সনদে উল্লিখিত সর্বশেষ উদ্দেশ্যটি হলো - সর্বজনস্বার্থে রাষ্ট্রগুলিকে এক সুত্রে বাঁধা।
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নটি যথার্থ গুরুত্বই পেয়েছে। কারণ শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ না থাকলে অন্য উদ্দেশ্যগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার গুরু দায়িত্ব যৌথভাবে পেয়েছে **নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা।**

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সম্বন্ধে বলা যায় যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব না থাকলে সন্দেহ, ভীতি ও অবিশ্বাস আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ততীয় উদ্দেশ্যটিতে যে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল যে সামাজিক স্থিরতা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার পরিপন্থী।

উদ্দেশ্যগুলি যতই মহৎ হোক না কেন, সেগুলি কখনই সার্থক হবে না যদি শক্তিশালী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলির পাশে এসে না দাঁড়ায় এবং দুর্বল দেশগুলিও তাদের নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা না করে।

<u>সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিগুলি :</u>

এই নীতিগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল।

- সর্বপ্রধান নীতি হল - **সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকসাম্য (Sovereign Equality)**। এই নীতিটির দুইটি দিক আছে-একটি হল সদস্যরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও অন্যটি রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের প্রশ্ন। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যায় যে রাষ্ট্রগুলি সমান শক্তির অধিকারী নয়।

- দ্বিতীয় নীতিটি হল - **সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।**

- তৃতীয় নীতি - **সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের বিরোধ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করতে হবে।**

- তৃতীয় নীতির অনুসরণেই চতুর্থনীতির সৃষ্টি।

- চতুর্থ নীতি - **সদস্য-রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি সামরিক শক্তি প্রয়োগ তো করবেই না, এমনকি শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনও করবে না** | যদিও সনদের ৫১ ধরা অনুযায়ী আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে|

- পঞ্চম নীতি - **কোন দেশ যদি উপরোক্ত নীতিকে লঙ্ঘন করে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে,তবে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং এই কাজে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে একজোটে সক্রিয় হতে হবে**| এই পরিস্থিতিতে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে, সেই রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যবর্গ কোনওরকম ভাবে সাহায্য করবে না। সুতরাং এই প্রশ্নে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই। সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সেই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রটি শাস্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে শাস্তি পাবে কি না এবং কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে এ সম্বন্ধে যদিও প্রশ্ন থেকেই যায়।

সনদের ২নং ধারার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ- যদি কোন রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপঞ্জর সদস্য না হয়, তবে জাতিপুঞ্জের সনদের বিধিবিধান সেই রাষ্ট্রের উপর আরোপিত কিনা এই প্রশ্ন থেকে যায়। সনদ যেহেতু একপ্রকারের চুক্তি, সাধারণভাবে বলা যায় যে, সনদ অন্যান্য চুক্তির মত কেবলমাত্র স্বাক্ষরকারী দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অ-স্বাক্ষরকারী ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রের উপর নয়। কিন্তু সনদের ২নং ধারায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি অনুযায়ী কাজ করে সেই ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ সচেষ্ট থাকবে।

সনদের ২নং ধারার সপ্তম পরিচ্ছেদ - সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিজ নিজ এক্তিয়ার অন্তর্গত কিছু নির্দিষ্ট জরুরি বিষয় থাকে যেগুলির উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের বিধি-বিধান আরোপ করা যায় না। এই বিশেষ জরুরি বিষয়গুলির কোন কোনটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আলোচ্যসূচীতে এসে পড়েছে এবং বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সে-সব ক্ষেত্রে আলোচনাগুলি নিয়ে আপত্তি এবং বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আলোচিত রাষ্ট্রগুলি এই আলোচনাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিধি-বহির্ভূত হস্তক্ষেপ ('intervention') গণ্য করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। উপরোক্ত এই ধরনের বিশেষ কোন বিষয় যদি জাতিপুঞ্জে শুধুমাত্র আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাকে 'হস্তক্ষেপ বলা যায় না। কোন ঘটনায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা থাকলে, সেই বিষয়টি কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই 'হস্তক্ষেপ (intervention) শুধুমাত্র কোন দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।